

কলাম

প্রতিক্রিয়া

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ঐতিহ্যের ভারী মুকুট বনাম জ্ঞানহীন এক টবের গাছ

মোস্তফা মুশফিক

প্রকাশ: ০৩ জুলাই ২০২৬, ১৮: ৪৪



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফাইল ছবি

১৯২১ সালের ১ জুলাই। বঙ্গভঙ্গ রদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে নবাব সলিমুল্লাহর দান করা ৬০০ একর জমিতে যাত্রা শুরু করে এই ভূমির প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়। ৮৪৭ জন ছাত্র, ৩টি অনুষদ, ১২টি বিভাগ। যাত্রার শুরুতেই এই প্রতিষ্ঠান জড়িয়ে যায় জাতির ভাগ্যের সঙ্গে, প্রায় দৈবক্রমে।

তারপর ১০০ বছরের বেশি সময়। ভাষা আন্দোলনের রক্ত এই ক্যাম্পাসের মাটিতে। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রতিরোধ এই হলগুলোর দরজায়। স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু এই বটতলা, এই কার্জন হল, এই শহীদ মিনার। ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থান পর্যন্ত—বাংলাদেশের প্রতিটি রাজনৈতিক টার্নিং পয়েন্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম অবধারিতভাবে এসেছে।

কিন্তু ঐতিহ্যের এই ভারী মুকুট পরে থাকা প্রতিষ্ঠানটির মূল কাজের জায়গা, অর্থাৎ গবেষণার চিত্র বলে ভিন্ন কথা। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মোট বাজেটের মাত্র ২ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ, ২১ কোটি ৫৭ লাখ টাকা বরাদ্দ ছিল গবেষণায়। এ বছরের বাজেটে ইউজিসি প্রায় হাজার কোটি টাকা দিলেও গবেষণা খাতে আলাদা কোনো অর্থ বরাদ্দ দেয়নি।

তুলনাটা নিষ্ঠুর, হার্ভার্ড বছরে গবেষণায় ব্যয় করে সাড়ে ১২ হাজার কোটি টাকার বেশি, অক্সফোর্ড আরও বেশি, এমনকি ভারতের আইআইটি মাদ্রাজও দেড় হাজার কোটির কাছাকাছি।

তবু এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও ২০২৫ সালে স্কোপাস-ইনডেক্সড জার্নালে দেশের সর্বোচ্চ ১ হাজার ৭৮৯টি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা, আর কিউএস র‍্যাঙ্কিংয়ে এখনো দেশসেরা অবস্থান ধরে রেখেছে। কিন্তু বৈশ্বিক তালিকায় অবস্থান এখনো ৫৮৪, যা প্রশ্ন তোলে, ঐতিহ্যের পাশাপাশি জ্ঞান উৎপাদনে এই প্রতিষ্ঠান আসলে কতটা এগোতে পেরেছে।

এই প্রশ্নের একটা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ‘বিউপনিবেশায়ন’ তত্ত্বে। বিশ্ববিদ্যালয় মানে কী—এই প্রশ্নের উত্তরে দুটো শর্ত থাকে: জ্ঞানতাত্ত্বিক (সার্বিক জ্ঞানচর্চা) আর আইনি (সেই জ্ঞান রাষ্ট্র-সমাজের বিরুদ্ধে গেলেও প্রকাশযোগ্য)। কিন্তু ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের বিচ্ছিন্ন করেছে প্রাক্-ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ড থেকে—নালন্দা, সোমপুর, বিক্রমশীলার মতো মহাবিহারের ঐতিহ্য থেকে, যেখানে জ্ঞান ছিল ‘সংবৃত’ বা ব্যবহারিক সত্য, পশ্চিমা অর্থে চিরন্তন সার্বিক সত্য নয়।

ফলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হয়ে উঠেছে পশ্চিম থেকে আমদানি করা স্থবির জ্ঞানের পাঠকেন্দ্র, নিজস্ব জ্ঞান উৎপাদনের ক্ষমতাহীন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যেমনটা, বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে থাকে ‘বিলেতের আমদানি টবের গাছ’—দেশের মাটি থেকে চিরদিন বিচ্ছিন্ন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় চিরদিনই বিলেতের আমদানি টবের গাছ হয়ে থাকবে; সেটা মূল্যবান, হতে পারে, অলংকৃত হতে পারে, কিন্তু গাছকে সে চিরদিন পৃথক করে রাখবে ভারতবর্ষের মাটি থেকে; বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শখের জিনিস হবে, প্রাণের জিনিস হবে না।’ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর ঢাকা কলেজের মধ্যে তখন শুধু আইনি পার্থক্যই থেকে যায়, প্রাণের পার্থক্য থাকে না।

এই তত্ত্বীয় প্রেক্ষাপট মাথায় রেখেই এবার ফিরি আমার নিজের গল্পে। ২০২০ সালের এইচএসসি বিনা পরীক্ষায় পার করে প্রায় দুই বছর অপেক্ষার পর ২০২২ সালের জানুয়ারিতে বিশ্ববিদ্যালয়জীবন শুরু করি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

হিন্দি সিরিজে দেখেছিলাম, ‘আপুন কো জিন্দেগি মে কুচ ডেয়ারিং কারনা থা। সেই মত ডেয়ারিং সিদ্ধান্ত নিয়ে ভর্তি হলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগে। মাত্র কয়েক মাসেই ভ্রম কাটল। মনে হলো, এ কোথায় এলাম। আমাদের বিভাগে একটিমাত্র ক্লাসরুম। একই সময় দুই বর্ষের শিক্ষার্থীদের ক্লাস থাকলে আমরা কলাভবনজুড়ে হেঁটে হেঁটে ক্লাসরুম খুঁজি।

তারপর আস্তে আস্তে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে পরিচয় হলো। একেক সেমিস্টারের একদম শেষে এসে আগের সেমিস্টারের ফল পাওয়া, অফিশিয়াল ওয়েবসাইট হ্যাকড হওয়া, ডাউন থাকা—এসব ছিল নিত্যদিনের সঙ্গী। খুব বেশি আশা রাখলাম না। তখন থেকেই এখান থেকে বের হওয়ার দিন গোনা শুরু।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বড় একটা অভিজ্ঞতার অংশ হলো চার বছরের একটা ব্যাচেলর ডিগ্রিতে আমি তিনটি সরকার দেখেছি। একটি অভ্যুত্থান দেখেছি। একটি মহামারির শেষ দেখেছি।

অনেকে বলবেন রাজনৈতিক পরিবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চিত্র আমূল বদলেছে। হ্যাঁ সত্যি, এখন আর গণরুম-গেস্টরুম নেই। সিঙ্গেল বেডে দেড় হাত জায়গা নিয়ে দুজন ঘুমানোর চূড়ান্ত অস্বস্তি নেই, অনেক কিছু নিশ্চয়ই বদলে গেছে। ভাগ্যক্রমে অনাবাসিক শিক্ষার্থী হওয়ায় সেসবের মধ্য দিয়ে আমাকে খুব একটা যেতে হয়নি। একই কারণে আমার কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্রটা সত্যিকারার্থে খুব একটা বদলায়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের অবস্থায় কোনো পরিবর্তন নেই। আগে র‍্যাঙ্কিং যেমন ছিল, এখনো তেমন আছে। আগে ছাত্ররাজনীতির যে মারামারি-কোন্দল ছিল, এখনো তা আছে। আগে শিক্ষকেরা রাজনীতি করতেন, এখনো করছেন। আগে শিক্ষার্থীরা বিসিএস পড়া নিয়ে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে লাইন দিয়ে থাকত, এখনো থাকে। তাহলে ‘বিশ্ববিদ্যালয়’ গণ-অভ্যুত্থান পেরিয়ে কী অর্জন করল?

আমি দেখেছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমার অসংখ্য বন্ধুকে মরুভূমির তপ্ত বালির মতো শুষে নিয়েছে। আমাদের বহু বন্ধু, যারা অসম্ভব সুন্দর গান গাইত, বই পড়ত, ছবি আঁকত, সংগঠন করত, তারা এখানে এসে খেই হারিয়ে ফেলেছে। সারা দিন সরকারি চাকরির বই, সন্ধ্যায় সাইকেল চেপে টিউশনি আর প্রোটিনহীন ক্লাস্ত শরীরে গা এলিয়ে দিয়েছে ক্ষয়ে পড়া পলেন্ডারার নিচে।

বিশ্ববিদ্যালয় তো আমাদের সমাজেরই অংশ। মূলত এই গণ-অভ্যুত্থানে কোনো সামাজিক বিপ্লব ঘটেনি বলেই এখনো চিত্রটা একই রয়ে গেছে। বাংলাদেশে রাজনীতির যে ‘প্যাট্রন-ক্লায়েন্ট’ সম্পর্ক, তা এখনো রয়ে গেছে।

তাই ছাত্র ও শিক্ষকরাজনীতি করতে হচ্ছে এবং সে রাজনীতি ক্ষমতার রাজনীতি বলেই এতে পেশিশক্তি, লবিং ও কূটনীতির এত তুমুল ব্যবহার। সমাজে এখনো বেকারত্বের গ্লানি বয়ে বেড়াচ্ছে লাখ লাখ তরুণ। অল্প বেতনেও কী যেন লুকানো কিছু গুপ্তধন রয়ে গেছে সরকারি চাকরিতে। তাই তো বিয়ের বাজারে সরকারি চাকরির এত চাহিদা! তাই ছাত্ররা আর যাবে কোথায়?

বলেছিলাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণহীন হওয়ার কথা। আমি দেখেছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমার অসংখ্য বন্ধুকে মরুভূমির তপ্ত বালির মতো শুষ্ক নিয়েছে। আমাদের বহু বন্ধু, যারা অসম্ভব সুন্দর গান গাইত, বই পড়ত, ছবি আঁকত, সংগঠন করত, তারা এখানে এসে খেই হারিয়ে ফেলেছে। সারা দিন সরকারি চাকরির বই, সন্ধ্যায় সাইকেল চেপে টিউশনি আর প্রোটিনহীন ক্লান্ত শরীরে গা এলিয়ে দিয়েছে ক্ষয়ে পড়া পলেন্ডারার নিচে।

বেশির ভাগ শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থাও করুণ। সরকারি চাকরির বাজার ছাড়া বাকি ক্যারিয়ারে কেমন করছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ইংরেজি শুনে দেখি হেসে কুটিকুটি হন নেটিজেনরা। যাকে দেখে হাসেন, তাকে হয়তো গ্রামের স্কুলে শিক্ষকেরা ক্লাসরুমে ডেকে নেয় খুদে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা দিতে, হয়তো বাজারে কেউ সম্মান করে ডেকে বসতে দেয়; আশা করে, এই ছেলে একদিন বড় অফিসার হবে, মনে রাখবে তাকে।

কেন এমনটা ঘটে, সে পর্যন্ত হয়তো অনেকেই ভেবে দেখতে পারেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের কাছে তাই ‘স্টকহোম সিনড্রোম’-এর মতো। সবকিছু শুষ্ক নিয়েও সাইকেলের প্যাডেল চেপে সুউচ্চ অট্টালিকায় টিউশনিতে যাওয়া ছেলেটিকে এমনই এক ভবনে একদিন বাস করার স্বপ্ন দেখায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। যাদের কোনো কূলে কেউ নেই, তাদের এই নিষ্ঠুর-নিরানন্দ রাজধানীতে পায়ের নিচে লড়াই করার জন্য এতটুকু মাটি দেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১০৫ বছরে এতটুকুই অর্জন।

- মোস্তফা মুশফিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী

মতামত লেখকের নিজস্ব